জীবনে সত্যবোধ এবং নিরহঙ্কার

য়দ আলী আহসান এই লেখাটি ইন্তেকালের সপ্তাহখানেক আগে ইনকিলাব হিত্যে প্রকাশের জন্য পাঠান। সম্ভবত ঃ এটাই মরহুমের শেষ লেখা। বি.স.

মরা আমাদের জীবদ্দশায় সমৃদ্ধিতে ভাস্বর হতে চাই এবং গৌরবকে কাঙ্ক্ষা করি। আমরা প্রত্যাশা করি মানুষ যেন আমাদের গুণগান র। আমাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে যেন আমাদের মৃত্যুর পরও লোকেরা মাদের কথা স্মরণ করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই সব আকাঙ্ক্ষা নই মানুষকে সমৃদ্ধির শিখরে নিয়ে যায় না। যিনি মহৎ তিনি চ্ছার লোক হবেন। তিনি বিনয়ী হবেন এবং আত্মস্তুতি সম্পূর্ণ ীকার করবেন। জীবনের সার্থকতা সজীব জীবনযাপনের মধ্যে, চসাধনের বিন্দ্র ইচ্ছায় এবং নিরহঙ্কারের সম্পন্নতায়। সূফী করা বলে থাকেন যে, তারা ৪টি জ্ঞানকেএকমাত্র লক্ষ্য ও লম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর বাইরের সমস্ত জ্ঞানকে ীকার করেন। তারা বলেন, মানুষের প্রতিদিনের আহার্য নির্ধারিত ছে, কেউ তা বাড়াতেও পারে না, কমাতেও পারে না। সৃষ্টিকর্তার ছে মানুষ সব সময় ঋণী তার জীবন যাপনের জন্য। মানুষ এই আজীবন শোধ করতে থাকবে। তৃতীয়ত এটা অনুভব করা যে, জন তাকে চিরকাল অনুসরণ করছে, তাকে কখনও এড়ানো যাবে সে হচ্ছে মৃত্যু। সর্বশেষ কথা হচ্ছে, মানুষকে এটা জানতে হবে বিধাতা সবসময়ই তাকে দেখছেন। সুতরাং মানুষের এমন কিছু উচিত নয় যেজন্য তাকে লজ্জিত হতে হয়। কথিত আছে যে

দাদাদের এক রইস এক সময় তার বাগান দেখতে গিয়েছিলেন। নে দেখলেন যে মালীর স্ত্রী একজন উদ্ভিন্ন যৌবনা রমণী। তখন লালসা জাগ্রত হল। তিনি মালীকে একটি কাজে দূরে পাঠালেন। চলে গেলে মালীর স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি আমার সঙ্গে ঘরের রে আস।' মালীর স্ত্রী বলল, 'আপনি আমার মালিক, আপনার া পালন করতে পারি, কিন্তু কিভাবে পালন করি তাই ভাবছি। হ তো সবকিছুই দেখছেন এবং সর্ব মুহূর্তেই দেখছেন। তাকে াল করে কোন কিছুই করা তো সম্ভব নয়।' রইস তখন লজ্জিত দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন।

আসছে জনৈক দরবেশের সঙ্গে এক বাদশাহর সাক্ষাৎ হয়েছিল। া দরবেশের দরিদ্র বেশ দেখে বললেন, 'আপনি ইচ্ছা করলে র কাছে চাইতে পারেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।' বেশ বললেন, 'আমি আমার দাসের কাছে প্রত্যাশার হাত বাড়াতে না।' বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কথার অর্থ কি?' দরবেশ বললেন, 'আমার দু'জন দাস আছে তারা আপনার প্রভু– তাদের একজন হচ্ছে বাসনা, অন্যজন হচ্ছে প্রত্যাশা।' বাদশাহ উত্তর শুনে অসম্ভব লজ্জিত হয়ে দরবেশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এই গল্পের আমরা একটি তাৎপর্য খুঁজে পাই এবং তাৎপর্য হচ্ছে– বাসনা ও প্রত্যাশা থেকে মুক্ত হতে না পারলে মানুষের সিদ্ধি নেই।

মানুষ সর্ব সময় জ্ঞানের একটি ব্যাখ্যা দিতে চায়; তা হচ্ছে বিদ্যার্জন। কিন্তু সূফীরা এর অর্থ করেন অন্যভাবে। সূফীরা বলেন, জ্ঞান হচ্ছে সময়। নিরন্তর আমরা সময়ের মধ্যে যাত্রা করছি, সময় অতিক্রম করছি এবং পৃথিবীতে আমাদের সময়কাল শেষ হয়ে আসছে। সত্যিকারের জ্ঞান হচ্ছে সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করা– সদিচ্ছায় ব্যবহার করা এবং আল্লাহর চিন্তায় ব্যয় করা। সময় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য। সূফীরা এই জ্ঞানকে বলেন, 'ইলম-ই ওয়ারুত'। জ্ঞানের এই বহিঃপ্রকাশ আছে যা আমাদের কর্মের বাস্তবতায় ধরা পড়ে না, আবার এর একটি অন্তর্নিহিত স্বরূপ আছে যা চিত্তশুদ্ধি এবং উপলব্ধির অভিজ্ঞানে ধরা পড়ে। কিন্তু বাইরের কর্মব্যস্ততা যদি অন্তরের ধ্যান-নিমগ্নতার সঙ্গে যুক্ত না হয় তাহলে নিছক কর্মব্যস্ততায় সময়ের অপলাপ এবং অপহরণ ঘটে। তিনিই যথার্থ জ্ঞানী যিনি সময়কে শুভ তাৎপর্যে বিকশিত করেন।

দাতা গনজ বকশ তাঁর 'কাশফুল মাহজুব' গ্রন্থে সময়কে অনুভব করার কতকগুলো ব্যাখ্যা সূত্র দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সময়কে ব্যবহারের দু'টি প্রকৃতি আছে। একটি হচ্ছে প্রাথমিক, অন্যটি হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের। প্রাথমিক প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশে দৃশ্যগত আচরণ রূপলাভ করে এবং অভ্যন্তরীণ রূপসজ্জায় আত্মবোধ অভিজ্ঞাত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের বহিঃপ্রকাশে বিশ্বাসের বিনয়ের আচরণ রূপলাভ করে এবং অভ্যন্তরীণ রূপসজ্জায় ইচ্ছার সততা সম্পর্কে বোধ জাগে কিন্তু কখনই বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরঞ্চ একে অন্যের সম্পূরক।' আমার অন্তরের বিশ্বাস বাইরের আচরণে প্রকাশ পাবে, তেমনি বাইরের আচরণ আমার অন্তরের অভিপ্রায়কে লালন করবে।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন এবং সমৃদ্ধ করেন। আমি বিশ্বাস করি একমাত্র আল্লাহই আমাকে সাহায্য করতে পারেন, অন্য কেউ নয়। একমাত্র আল্লাহই আমাকে সদিচ্ছায় এবং সৎকর্মে প্রেরণা দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়। যখন আমার কোন কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় আমি বলি, আল্লাহর সাহায্যেই এটা সম্পন্ন হয়েছে যাকে 'তউফিক' বলা হয়। মুতাজিলা দেখেছিলেন তখন তিনি তাঁদের আত্মা বা রূহকে দেখেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এ সমস্ত রূহ ভাস্বর হয়েছিল। সাধারণ দৃষ্টিতে রূহ কখনও ভাস্বর হয় না, কিন্তু হৃদয়ের অনুভূতিগত দৃষ্টিপাতে তা ধরা পড়ে।

আত্মা যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি সুতরাং আত্মা 'ক্বদিম' বা চিরকালীন নয়, অর্থাৎ আত্মা স্বয়ম্ভূ নয়। আত্মা এক ধরনের সৃষ্টি এবং অন্য এক সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৃথিবীতে মানব জীবনে প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু আত্মা এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যেতে পারে না; যেমন একটি শরীরে দু'টি জীবন হতে পারে না, তেমনি আত্মারও দু'টি শরীর হতে পারে না। আত্মার অস্তিত্ব মানব জীবনের অস্তিত্বের পূর্বে অর্থাৎ শরীরের জন্মের পূর্বে আত্মার জন্ম ঘটেছে। এগুলো আমাদের অনুভবে কখনও আসে না এবং এ সম্পর্কিত বিবেচনাগুলো রহস্যময় এবং দুর্জেয়। আমাদের পার্থিব জীবন আল্লাহর কারণে। এ জীবনে আমাদের অস্তিত্ব আল্লাহরই মাধ্যমে, আমাদের প্রাণময় চৈতন্য আল্লাহরই মাধ্যমে, আমাদের প্রাণময় চৈতন্য আল্লাহরই একটি ইচ্ছার প্রকাশ এবং তাঁর সৃষ্টিলীলার মধ্যেই আমরা জীবন ধারণ করি। গৌতম বুদ্ধ আত্মাকে স্বীকার করেননি। তিনি তার পরিবর্তে 'মন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মানুষের যাত্রা অনন্তের পথে, এ পথে অনেক সংকট এবং বাঁক তাকে পেরোতে হয়, কিন্তু মনের নিষ্ঠা এবং পবিত্রতা থাকলে সে সবকিছু অতিক্রম করে অবশেষে নির্বাণ লাভ করে। এই নির্বাণ হচ্ছে সর্বসংশয় থেকে, সর্বশৈথিল্য থেকে এবং সকল কর্মের আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। কিন্তু ইসলামের ব্যাখ্যাটি অন্যরকম। ইসলামের বিচারে মন হচ্ছে দেহ সম্পর্কিত, কিন্তু আত্মা হচ্ছে ভিন্ন অস্তিত্বের। এভাবে আমরা জীবনের রহস্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করতে পারি। সূফীরা এ সম্পর্কে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং সূফীদের আধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে এ সম্পর্কে উপলব্ধিগত উন্মোচন আছে।

আমরা এ পৃথিবীতে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বাস করি। তাদের কেউ আমাদের বন্ধু হন, কেউ বা অপরিচিত থেকে যান। এ সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। কেননা মানুষ তার বন্ধুর আচরণকে অনুসরণ করে। সুতরাং চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধু নির্বাচন করতে হয়। যদি বন্ধু সৎ ব্যক্তি হন তাহলে তার সাহচর্যে আমি সৎ হব এবং কল্যাণকর্মে লিপ্ত হব। কিন্তু বন্ধু যদি দুর্বৃত্ত হয় তাহলে আমি দুষ্কর্ম না করলেও বন্ধুর দুষ্কর্মের প্রতি আমার সমর্থন থাকবে। কোন ব্যক্তি কাবাগৃহ প্রদক্ষিণের সময় বার বার বলছিলেন, "আল্লাহ আমার সঙ্গী-সাথীদের সৎপথে রাখুন।" একথা শুনে প্রদক্ষিণরত অন্য এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, "আপনি আপনার জন্য প্রার্থনা না করে বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করছেন। এ কেমন কথা?" তিনি উত্তর করলেন, "প্রত্যাবর্তনের পর বন্ধুদের সঙ্গেইতো আমাকে বসবাস করতে হবে; সুতরাং তারা যদি ভাল না হয়, তাহলে আমিও তো ভাল থাকতে পারব না।"

সঙ্গে আমার দীর্ঘসূত্রী সম্পর্কের বর্ণনা দেয়া কিংবা বিশ্লেষণ করা এ মুহূর্তে অসম্ভব, তেমনি হয়ত অসমীচীনও বটে। তবে সম্প্রতি অধ্যাপক সৈয়দ

একদিকে যেমন অযথার্থ, তেমনি আবার অতি সত্য এবং সঙ্গত।

ইতোমধ্যে আমি তার সম্পর্কে অবহিত হয়েছি ব্যাপকভাবে। প্রথমত প্রবেশিকা

ছাত্র জীবনে বঙ্গ ভাষাভাষী

পূর্বো স্কুল জীবন কেটেছে ইংরেজ আমলেই। কলেজ জীবন আরম্ভ হয় পাকিস্তান আমলের প্রথমার্ধে। আমার স্কুল ও কলেজ জীবনে অনেক ছাত্রকে দেখেছি

ঝড়ের মধ্যেও নিশ্চি

নিশ্চিত করা। তাই যুদ্ধকালে প্রয়োজন, গঠনমূলক পর্যায়ে উন্নততর মননশীলতা, শ্রেষ্ঠত আলী আহসানের দক্ষতা বাংলাদেশের সংস্কৃতি, বাংলা ব্যবস্থা, জনগণের জীবনবোধে তাঁর যে চিন্তা-ভাবনা তা শু অক্ষুণ্ন রাখার জন্যও তা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোচনা-পর্যালো কাঞ্চন তুল্য। বাংলাদেশের স্রোতস্বিনীর মত। কখন ও কি জানে না। জানার কথাও নয় স্রোতধারায় সমৃদ্ধ হয়ে দীর্ঘ অপ্রতিরোধ্য গতিতে সমুদ্রাবি তেমনি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্য ঐতিহ্য এবং জীবনধারার স্প ওঠে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ত চিন্তা-ভাবনা, ভাষা-সাহিত্য জীবনাচার এভাবেই সমৃদ্ধ

আবদুল মা

একজন শ্রেষ্ঠ মাই

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর হিসাব অনুসারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দেড় হাজার বছরের। ঐতিহাসিকগণ বাংলা সাহিত্যের এই আবহমান ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন– প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। সুকুমার সেন এই হাজার দেড়েক বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি প্রামাণিক ধারাবিবরণী তৈরী করেছেন। সৈয়দ আলী আহসান সে রকম কোন ধারাবাহিক সাহিত্য-ইতিহাস রচনা করেননি– কেবলমাত্র মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। কিন্তু তিনিই আমাদের মধ্যে একমাত্র, যিনি এই তিনটি যুগে সাবলীল অনায়াসে পরিক্রমণ করতে পারতেন। পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-ইতিহাস তিনি রচনা করেননি; কিন্তু

কবি হিসেবে আধুনিক– রবী কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ে জগতে প্রবেশ করেছিলেন। ছিল আধুনিকতার প্রথম প্র লিখতে শুরু করেন সিকান্দ সৈয়দ আলী আহসান, আ সৈয়দ নূরুদ্দীন, আবুল হো আলী আহসানের এককত্ব সঙ্গে কবিতাবিষয়ক ব্যাপক জীবনের শেষ পর্যন্ত। মাই ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলা সম্পর্কে তিনটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ তি